BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090013

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

বাঁকুড়ার লোকজীবনে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব

অর্পিতা চৌধুরী

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

Abstract:

ইতিহাসগতভাবে বাঁকুড়া জেলা রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে এই রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের যাতায়াত ছিল।দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদের তীর বরাবর ছিল প্রান্তিক বন্দর তাম্রলিপ্তগামী প্রাচীন পথ। বহু দূর দূর থেকে এই সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে ভিড় করত বণিকেরা। এই সব ভাগ্যান্বেষী বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন বৌদ্ধ এবং জৈন ভিক্ষুরা, জনাকীর্ণ বন্দরনগরীতে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসার ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্র লাভের সুযোগ থাকত।ফলে বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে বহু বৌদ্ধস্তূপ ও জৈন মন্দির পরিলক্ষিত হয়। যদিও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তিগুলি পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। চতুর্দশ শতকের মধ্যেই রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ইতিহাস লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। তবে বাঁকুড়ার লোকসমাজের বহু রীতিনীতিতে এই বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব এখনো রয়ে গেছে।

Keywords: *বাঁকুড়া, লোকজীবন, লোকসমাজ, বৌদ্ধ মন্দির, জৈন মন্দির, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তিগুলি পরিবর্তন, হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তর.*

Introduction:

ইতিহাস রাজবৃত্তের আবর্তনেই ভারাক্রান্ত। বড় বড় শহর রাজধানী রাজ্যের বিবরণ দিতেই তার সময় ফুরিয়ে যায়। যেসব জনপদের ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক গুরুত্ব কম, সেগুলি থেকে যায় উপেক্ষিত। তবু যদি উৎসাহ নিয়ে খুঁজে দেখা যায়, তবে এই সব আঞ্চলিক ইতিবৃত্তের বিবর্তন থেকে উদ্‌ঘাটিত হয় বহু অজানা তথ্য।ছোটনাগপুরের রুক্ষ পার্বত্য উপত্যকার পূর্ব-দক্ষিণ প্রাপ্ত যেখানে ক্রমে ঢালু হয়ে এসে মিলিত হচ্ছে সমতলভূমির সঙ্গে। সেই সব অঞ্চল ঊনবিংশ শতকে, এমন কি বিংশ শতকের প্রথম ভাগেও ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। বৃটিশ যুগে তাই এই অঞ্চলের নাম ছিল 'জঙ্গল-মহাল'। তিনটি ভারতীয় অঙ্গ রাজ্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছে এখানে—পশ্চিমবঙ্গ বিহার আর ওড়িশা। কৃষি বা শিল্পের দাক্ষিণ্য নেই এই অঞ্চলে। বাসিন্দাদের মধ্যে স্থানীয় আদিবাসী বাগদি, ডোম, মাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য। স্থানীয় জনজীবনে তাই ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কার ও প্রথা।কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এখানে মধ্যে মধ্যে জৈন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু জৈনমূর্তি এই অঞ্চলে রয়েছে যার কতকগুলি আকৃতিতে বৃহৎ, মানুষ প্রমাণ বা তার চেয়েও বড়। আবার

ছোট ছোট মূর্তিও অনেক আছে, যেগুলি কোনও মন্দির বা গাছতলায় কখনও বা গৃহস্থের বাড়িতে লক্ষী, নারায়ণ বা শিবের সঙ্গে একই আসনে পূজা পাচ্ছেন। সামাজিক জীবনে কিছু বৌদ্ধ রীতিনীতিরও অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের রুক্ষও বন্ধুর পরিবেশের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। আধুনিককালে এই অঞ্চলে জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রের অস্তিত্ব নেই। তবে রাঢ় বাংলার এই জঙ্গলময় পরিবেশে জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর অনুপ্রবেশের কারণ কি? এক সময়ে কি এখানে এক বা একাধিক জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল? ভেঙে পড়া মন্দিরের প্রস্তরখণ্ডগুলি কি তারই সাক্ষ্য দেয়? কি কারণে সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেল? ভাগীরথী অববাহিকার সমৃদ্ধ জনপদ ছেড়ে এই প্রতিকূল জঙ্গলময় পরিবেশেই বা কেন এই সব ধর্মকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল? এই প্রশ্নগুলি উঠতে পারে স্বাভাবিকভাবেই।

Discussion:

বঙ্গভূমির ইতিহাস, প্রাচীন গ্রন্থে যতদূর উল্লেখ পাওয়া যায়, খুব সুস্পষ্ট নয়। ঐতরেয় আরণ্যক (আনুমানিকখৃঃ পূঃ ৭০০) 'বঙ্গ' ও 'বগধ (মগধ) বাসীদের উল্লেখ করেছে 'অসুর' নামে। বৌধায়ন ধর্মসূত্র (আনুমানিক ৫০০/৬০০ খৃঃ পূঃ) ১।১।২-তে দেখা যায় বঙ্গ কলিঙ্গ সৌবীর প্রভৃতি দেশে আর্যরা যদি তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্যান্য কারণে গিয়ে থাকেন তবে তাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে শুদ্ধিলাভ করতে হবে। অতএব এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, আর্যরা বঙ্গ প্রভৃতি দেশকে সযত্নে পরিহার করতেন।প্রাচীন ইতিহাস বলে, আমাদের আলোচ্য ভৌগোলিক পরিধির সেকালের নাম ছিল রাঢ় অথবা রাঢ়া। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, রাঢ়াদেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলের অপর নাম সুহ্ম। মহাভারতের ভাষাকার নীলকণ্ঠও সুহ্ম এবং রাঢ় দুটি জনপদকে এক এবং সমার্থক বলেছেন। দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের শক্তিগড় তাম্রলিপিতে বলা হয়েছে উত্তর রাঢ় ছিল কঙ্কাগ্রাম ভুক্তির অন্তর্গত। জৈন গ্রন্থমতে এই-ই হল বঙ্গভূমি। রাঢ়ের এই অঞ্চলকে বলা হয়েছে অজলা ও উষর, স্থানে স্থানে জঙ্গলময়। (ভবিষ্য পুরাণ : ব্রহ্মখণ্ড, ১৫-১৬ শতক)।

সুহ্ম-সুহ্মভূমি। বরাহমিহিরেরর বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে (xvi) বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে সুহ্মের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এটিই পরবর্তী কালের দক্ষিণ রাঢ়। চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের সৈন্য দণ্ডভুক্তি অধিকার করেছিল। তার পরবর্তী অঞ্চলই দক্ষিণ রাঢ় বা 'তককন লাঢ়ম' (তিরুমালাই লিপি)।বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮) থেকে দেখা যায় পূর্ব বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমি ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি এই দুইয়ের মধ্যে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলকে O' Mallyবলেছেন connecting link বা যোগসূত্র। ভোগোলিক বিচারে দেখা যায় পশ্চিমের উচ্চ মালভূমি থেকে বাঁকুড়ার জমি ক্রমে পূর্বে ঢালু হয়ে গেছে এবং পশ্চিমের উচ্চ ভূভাগে বেশ কিছু ছোটখাট পাহাড় রয়েছে যেমন শুশুনিয়া, বিহারীনাথ। এই উচ্চাবচ ভূপ্রকৃতির জন্য এখানে নদীগুলির প্রবাহ পশ্চিম থেকে পূর্বমুখে। নদীগুলির মধ্যে প্রধান দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও কংসাবতী। এগুলি কিছুটা পরস্পর সমান্তরালভাবে জেলার পশ্চিম থেকে পূর্বে যেন আড়াআড়ি বয়ে গেছে।Sir William Hunter বলেছেন—

"সম্পন্ন এবং সুশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলিম জনগণের পরিবর্তে পশ্চিমের অঞ্চলগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যায় অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ করা যায় এবং এদের সংগঠনে আদিবাসী বা অর্ধ-হিন্দু উপাদানের প্রবল প্রভাব রয়েছে।" (Preface to Vol. - IV, Statistical Account of Bengal)

অশোক মিত্র কৃত ১৯৫১ সালের বাকুড়া ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই জেলার আদিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৪২ ভাগ আবার অন্যদিকে খৃস্টপূর্ব যুগ থেকেই বহিরাগত বর্ণহিন্দুরা ধীরে ধীরে গাঙ্গেয় উপত্যকাতে যেমন- রাঢ়ভূমিতেও তেমনই অনুপ্রবেশ করেছিলেন। নতুন বাসযোগ্য স্থানের সন্ধান এবং জীবিকা অর্জন, অস্তিত্ব রক্ষার এই অন্যতম দুটি শর্ত অনুসারে আর্য হিন্দু সংস্কৃতি আর আদিবাসী সংস্কৃতি উভয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।এই সংমিশ্রণের ফলে রাঢ় অঞ্চলে যে বিশিষ্ট সংস্কৃতির

ধারা গড়ে উঠেছিল, ভাগীরথীতীরবাহী জনপদের সভ্যতা থেকে তা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি স্মরণ করেছেন—'দুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষের ক্ষেত্র, সমন্বয়ের ক্ষেত্র হল মধ্যবর্তী রাঢ় অঞ্চল'। অর্থাৎ বর্তমান বাঁকুড়া- পুরুলিয়া জেলা।

জৈন আচারাঙ্গ সূত্রের (খৃঃ পূঃ ৩০০) রাঢ় বিষয়ক কাহিনীটি বহু পরিচিত। তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ় দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তখন এই প্রদেশ ছিল পথঘাটবিহীন জঙ্গলাকীর্ণ। জৈন সন্ন্যাসীদের বহু ক্লেশে কুখাদ্য খেয়ে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। এমন কি অনুন্নত রাঢ় দেশের অধিবাসীরা তাঁর প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল, ঢিল ছুঁড়েছিল। অর্থাৎ আর্যসভ্যতা এদেশে তখনো ছাড়পত্র পায়নি। নীহাররঞ্জন রায় সঙ্গতভাবেই অনুমান করেছেন যে, তারা আদিবাসীদের আমিষবহুল খাদ্যই পেয়েছিলেন। সেটিই 'অ-খাদ্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।ঐতিহাসিকদের মতে, খৃস্টিয় যুগ শুরু হবার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদি প্রয়োজনে বহু আর্য বাংলায় আসেন এবং বসবাস করতে থাকেন। বিশেষ করে গুপ্তযুগের তাম্রশাসন ও শিলালিপিগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, খৃস্টিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের যথেষ্ট পূর্বেই আর্যদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রভাব রাঢ় অঞ্চলে ছিল মন্থর-বিস্তারী, কারণ এই অরণ্যভূমির জনগণ তাদের প্রাচীনতর অনার্য-ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেনি। এমন কি বর্তমানকালেও এই আর্যের সমাজ ও ধর্মের অস্তিত্ব জীবন্ত রয়েছে। এখানেই রাঢ় সংস্কৃতির বিশেষত্ব। আবার জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্মমতও বিভিন্ন যুগে আলোচ্য অঞ্চলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অপর দিকে বুদ্ধ স্বয়ং সুক্ষ রাষ্ট্রের 'সেদক' নামক নগরে এসেধর্ম প্রচার করেন। (I.H.J. 1950, Vol. XXXII., No. 1-4, Page-193) তেলপত্ত জাতকে বুদ্ধদেবের সুক্ষের অন্তর্গত 'দেশক' নগরে আগমন ও 'জনপদকল্যাণী সূত্র' দেশনারে উল্লেখ আছে।সিংহলি বৌদ্ধ গ্রন্থ দীপবংশ (IX. 1) ও মহাবংশে (VI. 35) উল্লেখ আছে- বঙ্গরাজ সিংহবাহু লাল বা রাঢ় জনপদে সীহপুর নামে নগর পত্তন করেন। অবশ্য উল্লিখিত লাট দেশ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন রাঢ় জনপদ, না কি কাথিয়াবাড় অঞ্চলের লাটদেশ সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।'বঙ্গীশ' নামে একজন বঙ্গদেশজাত ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায় (অপদান পালি, ১৪৫নালন্দা); বঙ্গে জাতোতি বঙ্গীসো বচনো 'হসসরোতি'। কালিক নামে তাম্রলিপ্তের একজন ভিক্ষু ছিলেন ষোড়শ মহাস্থবিরের অন্যতম (বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ৪০)। এইসব উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধের সমকালেই পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। তবে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক প্রভাবের নিশ্চিত প্রমাণ উত্তরবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে যতটা পাওয়া যায় রাঢ়ভূমি বিশেষত দক্ষিণ রাঢ়ে বর্তমান বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের সেরূপ ব্যাপকতা চোখে পড়ে না। দামোদর নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বর্ধমানের পানাগড় অঞ্চলে অবশ্য একটি বৌদ্ধস্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। (সময়কালআনুমানিক ৮ম শতক, Mahabodhi 1974. Vol-42 April-May, No. 4-5. Page- 214)।তাম্রলিপ্ত শহরেও ফা-হিয়েন বৌদ্ধধর্মের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র দেখেছিলেন। সেখানে বাইশটি সংঘারামে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। কিন্তু বাঁকুড়া অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর বাঁকুড়ায় কিছু বিক্ষিপ্ত প্রত্নুনিদর্শন ব্যতীত, বৌদ্ধস্তূপ বা বিহারের সন্ধান দেখা যায় না। সমাজজীবনে অবশ্য বৌদ্ধ প্রভাব পড়েছিল, তা পরবর্তী পর্যায়েআলোচিত হবে।

জৈনধর্মের প্রভাব ও প্রসার বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে এর তুলনায় ব্যাপক। জৈনধর্মে উল্লেখিত 'সমেত-শিখর' অর্থাৎ তীর্থঙ্করদের সাধনস্থল হল বিহারের পরেশনাথ পাহাড়। এটি রাঢ়ভূমির অনতিদূরে অবস্থিত। সুতরাং নিকটবর্তী অঞ্চলে জৈনধর্মের বিস্তার ঘটা স্বাভাবিক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ধানবাদ-বরাকর এলাকা থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রেওয়া এবং ওড়িশার অরণ্যময় অঞ্চল পর্যন্ত জৈনধর্ম একদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সব স্থানে বহু জৈনমন্দির ও জৈনমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পুরুলিয়া সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু জৈনমূর্তি ও দেবালয়ের ভগ্নাংশের নিদর্শন সযত্নে রাখা

আছে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ক্ষুদ্র মিউজিয়ামে। মগধ মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং সহজেই বোঝা যায় প্রান্তিক বন্দরনগরী তথা বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র তাম্রলিপ্তের সঙ্গে মগধের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।সিংহলি গ্রন্থ 'মহাবংশে' বলা হয়েছে মৌর্য সম্রাট অশোক তার কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠাবার সময়ে 'বিঞ্ঝন পথ' দিয়ে মাত্র সাতদিনে পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। সুতরাং মগধ ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে কোনও সংক্ষিপ্ত পথ ছিল। সে পথ অবশ্যই বিহারের জঙ্গলময় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাঢ়ভূমি পার হয়ে। আবার সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং প্রায় ৬০০ বণিকের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে বোধগয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭২-৭৩খ্রিস্টাব্দে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়র মিঃ বেগলার রাঢ়ভূমিসন্নিহিত পশ্চিমাংশের অরণ্যে বেশ কিছু জৈন পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন এবং কিছু কিছু প্রাচীন পথঘাটের সন্ধান পান। সুতরাং এই প্রাচীন পথ, যা তাম্রলিপ্ত থেকে রাঢ়ভূমির বুক চিরে বর্তমান বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিহারের মালভূমি অঞ্চল পার হয়ে পাটনা-বোধগয়ার দিকে চলে গেছে তার বহুল ব্যবহার ছিল। বর্তমান বিহারের গিরিড়ি-নওয়াদা অঞ্চলে 'রানী গদার' নামক স্থানে কয়েকটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলির অবস্থান ও আকৃতি দেখে ঐতিহাসিকরা মনে করছেন এগুলি পথের ধারে সরাইখানারূপে ব্যবহৃত হত। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই সব পথ, বাণিজ্য পথরূপে ব্যবহৃত হত।

বাঁকুড়া সদর শহরে একটি অতি প্রাচীন চৌমাথা দেখা যায়। এটির বর্তমান নাম রানীগঞ্জের মোড়। এখান থেকে একটি প্রাচীন পথ পশ্চিমদিকে পাটপুর-কেঞ্জাকুড়া-ছাতনা থেকে পুরুলিয়ার পথে রঘুনাথপুর –তেলকুপি- ঝরিয়া-রাজৌলী-রাজগীর হয়ে পাটনা পৌঁছেছে। অপর একটি প্রাচীন পথ দঃপঃ মুখে দেউলভিড়া হয়ে পুরুলিয়া জেলার পাকভিড়া, মানবাজার-বরাবাজারের মধ্য দিয়ে দুলমির কাছে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে প্রসারিত। তৃতীয় পথ উত্তরদিকে গঙ্গাজলঘাটি মেঝিয়া হয়ে দামোদর পার হয়ে রানীগঞ্জের পথে ভীমগড়-নাগোর বক্রেশ্বর-মুঙ্গের গিয়েছে। মানিকলাল সিংহ মনে করেন এই সব পথেই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন নগরগুলির সঙ্গে মধ্য রাঢ় অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে উত্তর রাঢ় থেকে কলিঙ্গ যাবার একটি বহু প্রাচীন পথ ছিল বর্তমানের কাঁকসা-সোনামুখী অবন্তিকা-বিষ্ণুপুর-দণ্ডভুক্তিগামী এবং দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদের তীর বরাবর ছিল তাম্রলিপ্তগামী প্রাচীন পথ। কারণ, তাম্রলিপ্ত তখন প্রান্তিক বন্দররূপে দেশবিদেশে খ্যাত। বহু দূর দূর থেকে এই সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে ভিড় করত বণিকেরা। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সব ভাগ্যান্বেষী বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন বৌদ্ধ এবং জৈন ভিক্ষুরা, নতুন নতুন দেশে নিজ ধর্মের পতাকা তুলে ধরার জন্য। বিশেষ করে জনাকীর্ণ বন্দরনগরীতে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসার ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্র লাভের সুযোগ থাকত। এইভাবে বাণিজ্য পথের পাশে পাশেই বণিকদের যে সব বিশ্রামকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, নিয়মিত বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সেখানেই ধর্মকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যেসবস্থানে জৈন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তার সবগুলিই উল্লেখিত পথগুলির উপর অবস্থিত। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই বাণিজ্য পথ ধরেই উত্তর ভারত থেকে এবং কলিঙ্গ থেকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল রাঢ় অঞ্চলে। কারণ, কলিঙ্গে এর বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (খারবেল শিলালিপি)।

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করেছেন যে, জঙ্গলাচ্ছন্ন মধ্য রাঢ় অঞ্চলে নদীপথই ছিল লোক চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এখানেও সভ্যতা কেন্দ্রগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতীর গতিপথ ধরেই কিছু দূরে দূরে বর্ধিষ্ণু প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র ধরাপাট, ডিহর, অম্বিকানগর প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল।পুরুলিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে দুলমি, দেউলি, সুইসা প্রভৃতি গ্রামে কয়েকটি জৈনমন্দির এবং পার্শ্বনাথ ও শান্তিনাথের জৈনমূর্তি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আছে পুরুলিয়ার পাকভিড়া গ্রামের পদ্মপ্রভ, ঋষভনাথ ও প্রতিমা—সর্বতো ভদ্রিকার মূর্তি। নির্মলকুমার বসু মনে করেন, মানভূম একসময় জৈনধর্মের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। প্রসঙ্গত তিনি তেলকুপি, ছড়রা, লৌলাড়া, পুঞ্চা প্রভৃতি গ্রামের জৈনমূর্তির উল্লেখ করেছেন। তেলকুপি গ্রামটি ডিভিসি-র পাঞ্চেৎ জলাধার নির্মাণের সময় জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল (১৯৫৭ খৃঃ)। জেডি বেগলার তাঁর 'রিপোর্ট অফ এ ট্যুর থ্রু বেঙ্গল প্রভিন্সেস' (১৮৭৮) রচনায় উল্লেখ করেছেন এখানে ২০টি মন্দির ছিল।

বর্তমানে মাত্র ৩টি মন্দির টিকে আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত থেকে এই অঞ্চলে তৈলকম্প নামে একটি রাজ্য ছিল মনে করা হয় (আনুমানিক একাদশ শতক)। এই তৈলকম্প বা তেলকুপি ছিল বন্দরনগরী। জৈন ব্যবসায়ী বিশেষত তামার ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চলে যাতায়াত করতেন, কারণ তামাজুড়ি ও তামাখুন এই দুটি প্রাচীন তাম্রখনি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। যাই হোক এখানে বিক্ষিপ্ত কিছু ঋষভনাথের মূর্তি, ভগ্ন তীর্থঙ্কর মূর্তি, জৈন শাসন যক্ষিণী ও বাহুকলির মূর্তি, জৈন দেবী চক্রেশ্বরী (স্থানীয়ভাবে নীলকণ্ঠ বাসিনী বলে পরিচিত) প্রভৃতি এখনো চোখে পড়ে।প্রকৃতপক্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাম্রলিপ্তে জৈনধর্মেরও একটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কারণ, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস যে গোদাস-গণ প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে তা চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। তাই অন্যতম গণই হল 'তাম্রলিপ্তিকা'।

পাল ও সেন-যুগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম, কারণ পাল রাজারা উদার মতাবলম্বী হলেও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু জৈনধর্মের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। পাল বা সেন রাজাদের তাম্রশাসনে জৈনধর্মের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার রাঢ় অঞ্চল যেহেতু পাল রাজবংশের সুদৃঢ় কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্গত হয়নি, যেহেতু সেখানে বেশির ভাগ স্থানে স্থানীয় দেশজ রাজাদের শাসনই প্রচলিত ছিল, সম্ভবত সে কারণেই খৃস্টিয় অষ্টম-নবম শতকেও এই অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এই অভিমত পোষণ করেন।বাঁকুড়ার স্থানে স্থানে জৈনমন্দির ও জৈনমূর্তির বহু নিদর্শন চোখে পড়ে। তবে এগুলি প্রায় সবই অন্তত খৃস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে নির্মিত। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই জৈন নিদর্শনগুলি যে কিভাবে মিশে গেছে সে বিষয়টি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক।

বাঁকুড়ার একেবারে উত্তর পশ্চিমে বিহারীলাল পাহাড়। এর উত্তর সানুদেশে একটি আধুনিক ছোট হিন্দু মন্দিরের পাশে একটি বহু প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি আছে। এর মাথায় নাগছত্র। অন্যদিকে একটি দ্বাদশভুজ মূর্তি আছে যার নির্মাণে জৈন তীর্থঙ্কর ও ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণুমূর্তির এক অভিনব সংমিশ্রণ দেখা যায়। দামোদর নদ এখান থেকে মাত্র দু-তিন মাইল দূরে। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন এখানে একটি জৈন ধর্মকেন্দ্র হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বেশ কয়েকটি জৈন ধর্মকেন্দ্র গড়েউঠেছিল। বাঁকুড়া শহরের অনতিদূরে সোনাতোপলের মন্দির একটি বৃহৎ ভগ্নস্তূপ। এটি দেউলরীতির স্থাপত্যের নিদর্শন এবং বহুলাড়ার বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে এর গঠনরীতির বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সংলগ্ন মাটির ঢিপিগুলিতে যথাযথভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয়নি। হয়তো সেখান থেকে জৈনধর্মের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।বহুলাড়া গ্রামের বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে এই ইঁটের মন্দিরটি সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। (প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক দশম-একাদশ শতক)। তবে আদিতে এটি কোন ধর্মের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সঠিক নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। বর্তমানে এটি শিবমন্দির। আবার গর্ভগৃহের দেওয়ালে গণেশ ও দুর্গামূর্তির মধ্যে একটি প্রায় চারফুট উচ্চতার পার্শ্বনাথ মূর্তি গাঁথা রয়েছে। এখন অবশ্য এটিকে জৈনরীতিতে উপাসনা করা হয় না। নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের জনপ্রিয়তার ফলে জৈনমন্দিরে শিবকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, না কি কোনও নিকটবর্তী স্থান থেকে পার্শ্বনাথকে এনে শিব মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে, ইতিহাস সে বিষয়ে নীরব। তবে সংলগ্ন ধ্বংসাবশেষ খনন করে ছোট ছোট গোলাকৃতি ও চতুষ্কোণ স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন এর উপরাংশে যেসব স্তূপ ছিল সেগুলি 'দেখিতে বিহারের স্তূপ অথবা বর্ধমান স্তূপের ন্যায় ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।' মথুরার কাছে কঙ্কালীটিলায় অনুরূপ জৈনস্তূপ দেখা যায়। মন্দিরের বহিরঙ্গে যে ব্যাপক অলঙ্করণ রয়েছে তার মধ্যে কুলঙ্গির উপরে উপরে দেউলের ছোট ছোট প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা আছে। ফলে মন্দিরের মূল চূড়াটি ভেঙে গেলেও মূল মন্দিরের নকশাটি অনুমান করা যায়। এক্তেশ্বর এবং ডিহরের মন্দিরগাত্রেও একই পদ্ধতির অলঙ্করণ আছে। এটি ওড়িশা শৈলীর প্রভাব।

ধরাপাট—দ্বারকেশ্বরের উত্তরতীরের এই গ্রামটিতেও একটি রেখ-দেউল দেখা যায়। এর দুদিকের দেওয়ালে দুটি কালো পাথরের যথাক্রমে ছ'ফুট ও তিন ফুট উচ্চতার দুটি দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি আর একদিকে একটি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি দেখা যায়। অদূরে প্রাচীন মন্দিরের বিলুপ্তপ্রায় ভগ্নাবশেষ রয়েছে। নিকট অতীতে বর্ধমানরাজ এখানে কৃষ্ণরাধার বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে সেটিও অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও এই মন্দিরে হিন্দু রীতিতেই সন্তানহীনা নারীরা এখানে পূজা ও মানত করে থাকেন। মন্দিরগাত্রে দিগম্বর মূর্তি থাকার জন্যই সম্ভবত এর নাম 'নেংটা ঠাকুরের মন্দির'।এই রেখদেউলের অদূরে একটি আধুনিক পাকা ঘরে একটি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ মূর্তিকে মনসা জ্ঞানে পূজা করা হয়। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে জৈনমূর্তি থেকে ব্রাহ্মণ্য দেবতাবিগ্রহে রূপান্তরের এটি একটি বিশেষ কৌতূহলজনক দৃষ্টান্ত। সপ্তমুখী নাগছত্রধারী এক পুরুষ মূর্তি এখানে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দুটি আজানুলম্বিত হাতের পাশে পাশে শঙ্খ ও পদ্ম উৎকীর্ণ করা হয়েছে এবং পিছনের পাথরে অতিরিক্ত দুটি শঙ্খ ও চক্রধারী হাত খোদাই করা হয়েছে। জৈনমূর্তি থেকে হিন্দু মূর্তিতে রূপান্তরের এইরূপ নিদর্শন আরও থাকতে পারে। এটি গবেষণাসাপেক্ষ। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের প্রভাবে অথবা পালযুগের সার্বিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্লাবনে এটিকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে। তবে বর্তমানে এই পুরুষ মূর্তিটি নাগদেবী মনসারূপে সাড়ম্বরে পূজা পান। অর্থাৎ দেবত্বের বিবর্তন আবার ঘটেছে।

বিষ্ণুপুর-সোনামুখীর পথে দ্বারকেশ্বরের উত্তর তীরে ডিহর গ্রাম। বাঁকুড়া জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এখানে দুটি ভগ্ন ল্যাটেরাইট পাথরের শিবমন্দির আছে। (আনুমানিক একাদশ শতক -রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। একদা দ্বারকেশ্বর বয়ে যেত ডিহরের উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে। বর্তমানে সেই মজে যাওয়া পুরনো নদীখাতের তীরে ডিহরের প্রাচীন ঢিবিগুলি দেখা যায়। এই গ্রাম থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং তার পরবর্তীকালের যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সেগুলি সংরক্ষিত আছে। ডিহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কিন্তু বেশ কিছু বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন ডিহরে বুদ্ধদেবের মুখ আঁকা একটি ক্ষুদ্র শ্বেতপাথরের লকেট পাওয়া গেছে। নিকটবর্তী পলাশী গ্রাম থেকে বৌদ্ধ দেবীমূর্তি ধরমপুর, মায়াপুর, পাঁচাল, ময়নামুনি, তালাজুড়ি প্রভৃতি গ্রাম থেকে পাথরের বিভিন্ন আকৃতির বুদ্ধমূর্তি এবং ডিহর ধাতুনির্মিত নিবেদনস্তূপের উপরাংশ ও পোড়ামাটির গোজ আকারের নিবেদনস্তূপ পাওয়া গেছে। ডিহরের নিকটবর্তী ছিলিমপুর, বনকাটি, ঠাকুরপুর, গহারহাটি (বর্তমান জয়কৃষ্ণপুর) ইত্যাদি গ্রামে সারিবদ্ধ ইটের তৈরি অনেকগুলি প্রকোষ্ঠের গাঁথনি ও ধ্বংসাবশেষের ঢিপি দেখা যায়। মানিকলাল সিংহের মতে, এখানে সঠিক প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করলে হয়তো কোনও প্রাচীন নির্মাণের সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ, তিনি বেগলারের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, ওই সব ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ইঁটের আকার উত্তর ভারতীয় প্রসিদ্ধ বিহার বা স্তূপের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ইঁটের অনুরূপ (পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়াসংস্কৃতি, পৃষ্ঠা- ৫৩)। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাকুড়ার উত্তর-পশ্চিমভাগের গ্রামগুলিতে কিছু কিছু প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কার এখনও রয়েছে। যেমন এই অঞ্চলে ১৩ বৈশাখ 'হালসাল' অর্থাৎ নতুন খাতার অনুষ্ঠান হয়। সেদিন অপরাহ্ণ গৃহস্থরা গৃহের ঈশান কোণে শেওড়া গাছের এ খুঁজে দেন। তাদের মতে, এতে বজ্রপাতের ভয় থাকে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে এটি বৌদ্ধ সংস্কার।

ডিহর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের যতগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, বাঁকুড়ার অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাচীন ভারতীয় জমির মানকরূপে ব্যবহৃত 'আঢ়ক', 'দ্রোণ' প্রভৃতি পরিমাপ মৌর্যশুঙ্গ যুগ থেকে অদ্যাবধি আলোচ্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। মানিকলাল সিংহ আরও মনে করেন যে, বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত দত্ত, রক্ষিত, পাল, দে প্রভৃতি পদবিগুলিও বৌদ্ধ সংস্কার থেকেই অনুসৃত হয়েছে। কারণ, সাঁচিস্তূপের ও অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধভক্ত এবং দাতাগণের নামে রক্ষিত, পাল, দত্ত প্রভৃতি বিশেষণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য সমস্ত ভূভাগেই বিভিন্ন গ্রামের খোলা গাছতলায় বা ছোট কুটিরে, ছোট ছোট বেদীর ওপর বহু দেবপূজার 'থান' (স্থান) দেখা যায়, যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, আদিবাসী যে

কোনও প্রকার মূর্তিই ফুল-বেলপাতা সিদুরযোগে পুজিত হয়ে থাকেন। স্থানীয় জনসাধারণের মিশ্র ধর্মবিশ্বাস এগুলিকে একই পর্যায়ভুক্ত করেছে। ধরাপাটের নিকটবর্তী বিষ্ণু/জৈনমূর্তির মনসা মূর্তিতে পরিণতির কথা আমরা এর পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এইভাবে স্থানীয় জীবনযাত্রার সংমিশ্রণে বেশ কয়েকটি জৈনমূর্তির রূপান্তরের কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

'ছান্দার'-এর কাছে 'পাঁচাল' গ্রামের একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পুকুরের নাম 'পরশা'। এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'পরবাসিনী'। 'পরশা' নামটি তীর্থঙ্কর পরেশনাথের নামের অপভ্রংশ হতে পারে। এই পুকুর থেকে বেশ কয়েকটি প্রাচীন দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। স্থানীয় শিবপূজার সমস্ত উৎসব এই পুকুরটিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। আবার চুয়ামসনা গ্রামের কপিলেশ্বর শিবের গাজনে এবং স্থানীয় মনসাপূজার সময় একটি পাথরের তৈরি জৈন দেউলের প্রতিকৃতিকে পূজা করা হয়। এই প্রতিকৃতিতে আদিনাথ, শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের মূর্তি রয়েছে।দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে জৈনধর্মীয় নিদর্শনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। সম্ভবত পাল-সেন যুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান দেখা দেয়, তখনও ওইসব অঞ্চলে দুর্গমতার কারণে পূর্বতন জৈন প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই এখনও বেশ কিছু জৈনমূর্তি এই সব অঞ্চলে দেখা যায়। অবশ্য আধুনিককালে এগুলি সবই লৌকিক প্রথানুযায়ী পূজিত হয়। যেমন জৈন শাসন যক্ষিণীর মূর্তি। রানীবাধ থানার অম্বিকানগরের অম্বিকা দেবী, রাইপুর থানার রাইপুরের মহামায়া, রাইপুর থানার সাতপটোমগুলকুলীর অম্বিকা, সিমলাপাল থানার জোড়সা ও গোতড়া গ্রামের অম্বিকা দেবী—এঁরা সকলেই জৈনশাসন যক্ষিণী। ইনি তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শাসনযক্ষিণী। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় উল্লিখিত যে সব গ্রামে এই অম্বিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সব গ্রামে দুর্গা প্রতিমার পূজা নিষিদ্ধ। অম্বিকাই সেখানে দুর্গারূপে পূজিতা হন। বাঁকুড়া জেলার এই সব অম্বিকা মূর্তির অধিকাংশের রূপই হল- একটি ফলন্ত আমগাছের তলায় শিশু সঙ্গে এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন, পায়ের কাছে একটি সিংহ। অনুরূপভাবে উত্তর বাঁকুড়ায় দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী প্রাচীন গ্রামগুলিতে 'আসিনী' নামযুক্ত দেবীদের পূজার প্রচলন দেখা যায়। যেমন ছান্দাও গ্রামের জঙ্গলাসিনী, পাঁচাল গ্রামের পরশাসিনী, বাকুড়া শহরের জিনাসিনী, রাঢ়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে এরূপ আরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী গ্রাম-দেবতারূপে পূজা পেয়ে থাকেন এবং এই সব গ্রামগুলিতে পৃথকভাবে শারদীয়া দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ। যেমন লোখেশোলের দেবী কামাখ্যা, নাড়িয়া গ্রামের সর্বমঙ্গলা দেবী, আবার বর্তমান মেদিনীপুর জেলার মুড়বেতার সর্বমঙ্গলা, গোয়ালতোড় গ্রামের সনকা প্রভৃতি। মানিকলাল সিংহ মনে করেন, এঁরা 'আসিনী' শব্দযুক্ত বৌদ্ধ দেবী। পালযুগে যখন বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন এই সব দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ার রানীবাঁধের ছ'মাইল উত্তর-পশ্চিমে কুমারী ও কংসাবতী নদীর সঙ্গমস্থল। এখানে অম্বিকানগর গ্রামে একটি প্রাচীন পাথরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে আধুনিককালে শিবের পূজা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি জৈন মন্দির ছিল (আনুমানিক একাদশ শতক- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। এখানে শিবলিঙ্গের পাশে একটি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান সুন্দর ঋষভনাথের মূর্তি দেখা যায়। এর পশ্চাৎপটে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি, বারটি সারিতে দুই দুই করে খোদাই করা। অম্বিকা এখানে প্রধানা দেবী। তাঁর পূজা হয় আধুনিক একটি মন্দিরে। তার মূর্তি কাপড়ে ঢাকা, মুখমণ্ডল সিদুরে লিপ্ত। তার দু'টি হাতের আভাস পাওয়া যায়, যার একটি ছোট মূর্তির মাথায় রাখা, পদতলে সম্ভবত বাহন সিংহ। দেবলা মিত্র এখানে আরও কিছু তীর্থঙ্করের মূর্তির খণ্ডাংশ দেখেছিলেন। (এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল - ১৯৫৮)। অনুমান করা যেতে পারে যে নদীপথের যোগসূত্রে এখানেও একটি জৈন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, যেটি কালক্রমে তার নিজস্বতাকে পরিবর্তিত করেছে।

কিছুদূরে 'চিৎগিরি'তে প্রাচীন লাল বালিপাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও একটি বহু প্রাচীন শান্তিনাথ মূর্তির দেখা পাওয়া যায়। 'বরকোলা'র প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকেও অম্বিকা মূর্তি, তীর্থঙ্কর মূর্তি, পার্শ্বনাথের পাদপীঠ, তীর্থঙ্কর খোদিত ক্ষুদ্র নিবেদনস্তূপ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই স্তূপটি থেকে লুপ্ত মন্দিরটির স্থাপত্যভঙ্গিমা বোঝা যায়। এটি উত্তর ভারতীয় রেখ-দেউলের অনুকৃতি ছিল।অম্বিকানগরের উত্তর-পশ্চিমে 'পরেশনাথ' নামক স্থানে নিপুণ ভঙ্গিমার একটি ছফুট উচ্চ পার্শ্বনাথ মূর্তি পাওয়া

গেছে। এই পরেশনাথেরেই বিপরীত দিকে কুমারীর দক্ষিণ তীরে চিআদা'তে তিনটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি দেখা যায়। শ্রীমতী মিত্র কংসাবতীর তীরে কেন্দুআ গ্রামের কাছেও অপর একটি জৈন কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। এখনও বহু প্রস্তরখণ্ড রয়েছে যেগুলিকে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ 'আমলক', 'খুরা', 'মণ্ডপ', 'খপুরি' ইত্যাদির অংশ পার্শ্বনাথ মূর্তির ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি বলে বোঝা যায়।

জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বয়ে গেছে 'শিলাবতী' বা শিলাই নদী। এর তীরে প্রাচীন গ্রাম 'হাড়মাসড়া' থেকে কে এন দীক্ষিত একটি বৃহৎ তীর্থঙ্কর মূর্তি আবিষ্কার করেন। নাগছত্রযুক্ত দিগম্বর পার্শ্বনাথের মূর্তিটি প্রায় পাঁচফুট উঁচু। তালডাংরা থানার দেউলভিড়া গ্রামে যোগাসনে উপবিষ্ট একটি নাগছত্রধারী পার্শ্বনাথ মূর্তি দেখা যায়।বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সলদা গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংগৃহীত কয়েকটি মূর্তি দেখা যায়। এগুলিকে জৈন তীর্থঙ্করদের পিতামাতারূপে ঐতিহাসিকরা নির্দেশ করেন। ফলন্ত আম্রবৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট নারী ও পুরুষ। উভয়েরই কোলে শিশুমূর্তি। নিচে পাঁচজন তীর্থঙ্করের মূর্তি।অতি সম্প্রতিকালে জয়কৃষ্ণপুর থেকেই আবিষ্কৃত দুটি টেরাকোটার টালি বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তি ভবনে সংগৃহীত হয়েছে। এই ফলকচিত্রে দেখা যায় নগ্ন পুরুষমূর্তি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। মাথায় নাগছত্রের বদলে সাপ ফণা তুলেছে পায়ের কাছে। চোখমুখ অনেকটা আদিবাসী মূর্তির গঠনের অনুরূপ। পুরাকীর্তি ভবনের অধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত অনুমান করেন এগুলি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিরই আদিবাসী অনুকরণ।রাইপুর থানার সাতপাটা মণ্ডলকুলী গ্রামে অনেকগুলি জৈনমূর্তি খোলা আকাশের নিচেই পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা মূর্তিচোরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টায় একটি মণ্ডপ তৈরি করে এগুলিকে দেয়ালে পরপর গেঁথে রেখেছেন। এখানেও নদীর ধারে বা জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছু অনাদৃত ভগ্নমূর্তি দেখা যায়। অর্থাৎ একসময় এই আপাতদুর্গম অঞ্চলেও বহু তীর্থঙ্কর মূর্তি গঠিত হয়েছিল। ধর্ম যদি এখানে বিশেষ সমাদৃত না হত, তবে এই অঞ্চলে এতগুলি মূর্তির সমাবেশ হত না।সোনামুখী থানার নায়েববাধ গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে একটি সাড়ে পাঁচফুট দীর্ঘ জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় মানুষ বলেন, দামোদরের বুক থেকে এটিকে একবার বন্যার সময় পাওয়া গেছে। একে তারা 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু প্রতি শ্রাবণ মাসের প্রথম শনিবারে তাঁরা এঁকে অন্নভোগ দিয়ে থাকেন সুবৃষ্টি এবং ভাল ফসলের জন্য এবং প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, অব্যর্থফললাভ হয়। অতএব তীর্থঙ্কর এখন গ্রাম-দেবতা। একইভাবে কেচন্দাঘাটের কাঁসাই নদীতীরে একটি অপরূপঅম্বিকা মূর্তি এখন গ্রামদেবতারূপে পূজা পাচ্ছেন। তাঁর মাথার উপর আম্রশাখা, পিছনের টালিতে তীর্থঙ্কর মূর্তি খোদিত, পায়ের নিচে পদ্ম, তার নিচে সিংহ মূর্তি।

আদিবাসীবহুল রাঢ় অঞ্চলে এক সময় যে জৈনধর্মের কেন্দ্রগুলি দৃঢ়মূল হয়েছিল, আলোচ্য বিবরণ থেকে এ কথা বোঝা যায়। এবং ধীরে ধীরে জৈনধর্মের ধারণা এই দেবদেবীর রূপকল্প স্থানীয় অধিবাসীদের নিজস্ব ধর্মচিন্তায় সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। যেমন পুরুলিয়া জেলার আদ্রা স্টেশনের নিকটবর্তী অঞ্চলে 'শরাক' নামে এক উপজাতি বসবাস করেন। নিরামিষ আহার গ্রহণ, অহিংসা নীতির পালন এবং রাত্রিকালে উপবাস প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতির পালন দেখলে এদের জৈনধর্মের অনুসরণকারী বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করে জৈন 'শ্রাবক' শব্দটির অপভ্রংশ হল 'শরাক'।আবার রাঢ়ের নিজস্ব দেবতা ধর্মঠাকুরের পূজা এই অঞ্চলে মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই ধর্মঠাকুরের রূপকল্প গড়ে উঠেছে, প্রধানত শিব ও বুদ্ধের সংমিশ্রণে। কারণ, গুপ্তযুগ ও তার পরবর্তী সময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ব্যাহত হয়েছিল। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং গৌড়রাজ শশাঙ্ককে 'বৌদ্ধনির্যাতক' বলে অভিযুক্ত করেছেন। (T Watters On Yuan Chwang's Travels in India. Vol.-II. Page- 180-99) আর্যা-মঞ্জুশ্রী মূল কল্পেও বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের বিবরণ আছে। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই নিপীড়িত ও নবজাগ্রত হিন্দুধর্মের কাছে পরাজিত হতে থাকে। (রাধাগোবিন্দ বসাক - History of Northern Eastern India Page- 55)।বাংলায় পালবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম শৈবধর্মের অনুবর্তী তান্ত্রিক ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে।(ভদন্ত প্রজ্ঞানানন্দশ্রী স্থবির; পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা- ২১)।

পালযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকালের পূজা করতেন (বি সরকার, The Folk Elements in Hindu Culture, Page- 193)। পঞ্চদশ শতকে রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণে' দেখা যায় 'শূন্য' হতে ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি হয়েছে এবং ধর্মঠাকুরই অন্যান্য দেবতার উৎপত্তিস্থল। ওই শূন্যপুরাণে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের উৎসব ও গাজনে ব্রতধারী ভক্তগণ নানাবিধ দৈহিক নির্যাতন স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন। অনেকে এর মধ্যে নির্গ্রন্থ জৈনদের দৈহিক কষ্ট স্বীকারের অনুকরণ দেখেন। অনেকে আবার মনে করেন, ধর্মঠাকুর, শিব, জগন্নাথ প্রভৃতি দেবতা কল্পনায় বুদ্ধদেবের প্রচ্ছন্ন রূপ রয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 'বুদ্ধ'কে 'বুদ্ধু' এবং বুদ্ধমূর্তিকে 'জটাশংকর' নাম প্রদান করা হয়েছিল। ধর্ম শব্দের বহু রূপান্তর হয়। (Discovery of Living Buddhism in Bengal, Page-I)। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিত বাঁকুড়া জেলারই ময়নাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে দাবি করা হয় এবং ময়নাপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ধর্মপূজার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। অবশ্য মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়ও একই গৌরবের দাবিদার। যাই হোক ধর্মঠাকুর একান্তভাবে রাঢ়ভূমিরই দেবতা। বাঁকুড়া-বীরভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলেই তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তৃত। নবজাগ্রত হিন্দুধর্মের প্লাবনে বৌদ্ধরা যখন তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা হারাচ্ছিলেন তখনই তারা ধর্মঠাকুরের রূপকল্পকে গ্রহণ করেন এবং আদিবাসীবহুল রাঢ় অঞ্চলেবর্ণহিন্দু সমাজের দেবতার পরিবর্তে এই ধর্মঠাকুরই প্রভূত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অদ্যাবধি বাকুড়ার স্থানীয় উৎসবে ও গাজনে সেই জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতক্ষণ আলোচিত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের জৈন স্থাপত্য নিদর্শন বা বৌদ্ধ প্রভাবের সময় নির্ধারণ করা যায় খৃস্টিয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে। বাংলার প্রখ্যাত প্রান্তিক বন্দর তাম্রলিপ্তের সুবর্ণযুগ ছিল তারও আগে, অষ্টম শতকের পূর্বে। তারপরে তার গৌরব ধীরে ধীরে অস্ত যেতে থাকে। যমুনা সরস্বতীর তীরে বর্তমান হুগলিতে 'সপ্তগ্রাম' বন্দর ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে। ত্রয়োদশ শতকে সোনারগাঁ প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। স্বভাবত বণিকদের গতিবিধিও তখন শুরু হয় অন্য পথে। বিহার থেকে এবং কলিঙ্গ থেকে রাঢ়ের মধ্য দিয়ে যে বাণিজ্য পথগুলি ব্যবহৃত হত তাদের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাম্রলিপ্তের গৌরব সম্পূর্ণই লোপ পেল। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল গৌড়-মুর্শিদাবাদে। নিয়মিত দূরগামী বণিকদের গতিবিধি কমে যাবার ফলে রাঢ়, ওড়িশা ও বিহারের মালভূমি অঞ্চলে যেসব জৈন ধর্মকেন্দ্র, বৌদ্ধ সংঘ গড়ে উঠেছিল, যে সব চলাচলের পথ নিয়মিত সার্থবাহের যাতায়াত মুখর থাকত, সেগুলির প্রাণপ্রবাহ শুকিয়ে গেল। চতুর্দশ শতকের মধ্যে ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বিস্মৃত হয়ে জঙ্গলে মুখ ঢাকল। পিছনে রয়ে গেল কিছু পাষাণময় সাক্ষ্যপ্রমাণ। রাঢ়ের জনজীবনে যুক্ত হয়ে রইল কিছু কিছু বহিরাগত বৌদ্ধ ও জৈন রীতির প্রভাব।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

(১) মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৫৫

(২) রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৪৯

(৩) ওম্যালী এল এস এস, বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার, কলকাতা, ১৯০৮

(৪) বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়কুমার, বাঁকুড়ার মন্দির, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৭১

(৫) বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়কুমার, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্ন ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৭১

(৬) মিত্র অশোক (সম্পাদনা), পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, পঃ বঃসরকার, ১৯৭১

(৭) বসাক রাধাগোবিন্দ, হিস্ট্রি অফ নর্থ-ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৭

(৮) স্থবিরভদন্ত প্রজ্ঞানশ্রী, পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭

(৯) সিংহ মানিকলাল, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, বিষ্ণুপুর, ১৩৮৪

(১০) মিত্র দেবলা, সাম জৈন এন্টিকুইটিজ ফ্রম ব্যাঙ্কুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, খণ্ড- ২৪, সংখ্যা-২, ১৯৫৮

(১১) রায় সুভাষ, তৈলকম্প, লোকায়ত পত্রিকা, বাঁকুড়া, ২০০০

Citation: **চৌধুরী. অ.**, (2025) "বাঁকুড়ার লোকজীবনে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.